বেচারি

(গল্পগ্রন্থ – বিধু মাস্টার)

কলিকাতায় বোমার হাঙ্গামা উপলক্ষে বহুদিনের কলিকাতা-বাস ত্যাগ করিয়া সপরিবারে গিয়া ভগ্নীপতির বাড়ি আশ্রয় লইয়াছি।

একেবারে অজ পাড়াগাঁ। রেল স্টেশন হইতে সাত ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া অথবা গরুর গাড়িতে গেলে গ্রামে পৌঁছানো যায়। ভগ্নীপতিদের মেটে বাড়ি, তাহাদেরই স্থান সঙ্কুলান হয় না, তবে বিপদের দিনে, আপাতত বোমায় মরিতে বসিয়াছি দেখিয়া তাহারা নিজেদের অসুবিধা করিয়াও বাহিরের ঘরখানি আমাদের জন্য ছাড়িয়া দিল। আমরা গরুর গাড়ি হইতে নামিতেই দেখি বাইরের ঘর হইতে তিনটি তোরঙ্গ, একটি বড় বিছানা, গোটা দুই পুঁটুলি স্থানান্তরিত হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম আমার ভগ্নীপতির মেজভাইয়ের শ্যালীপতি-ভ্রাতাও সপরিবারে ইচ্ছাপুর বা দমদম হইতে সপ্তাহখানেক পূর্বে আসিয়া এখানে আশ্রয় লইয়াছেন এবং বাহিরের ঘরে তাঁহারাই ছিলেন। বাড়ির মধ্যে রান্নাঘরের পাশে যে নাতিক্ষুদ্র ভাঁড়ারঘর আছে, আপাতত সেখানেই তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইল।

বহুদিন কলিকাতায় বাসা করিয়া আছি, বাড়ি করিবার সঙ্গতি অবশ্য নাই। সঙ্গতি ছিল না। এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম, জাপানী বোমার ঘায়ে সে বাড়ি কতক্ষণ টিকিত ?আমার যে-সব বন্ধুবান্ধবকে কলিকাতায় বাড়ি করিবার জন্য এতদিন হিংসা করিতাম, আজ তাঁহাদের প্রতি সে হিংসার ভাব করুণা ও সহানুভূতিতে পরিণত হইয়াছে। বেচারিদের পয়সাগুলা অনর্থক নষ্ট হইল।

দু-একদিন কাটিয়া গেল।

চারিদিকে চাহিয়া দেখি গ্রামের মধ্যে ভীষণ জঙ্গল, খানা ডোবা বাঁশবন। শীতের শেষ, স্ত্রী একদিন আমায় আসিয়া বলিলেন, ওগো, কত চালতে পড়ে আছে বনের মধ্যে—দেখবে এসো—

আমার স্ত্রী শহরের মেয়ে। পাড়াগাঁয়ের বনে বাগানে পাকা চালতে শীতকালে পড়িয়া থাকা বিশেষ আশ্চর্যের কথা নয়, তাহা না বলিয়া তাঁহার আনন্দটাকে আরো ঘনীভূত হইবার অবকাশ দিবার জন্যদুজনে বনের দিকে ছুটিয়া গেলাম।

—ওই দেখো এসে, ঢোক এই বনের মধ্যে।

—ওঃ, তাই তো ! এ যে অনেক দেখছি।

—এক-একটা চালতের দাম কলকাতায় দু পয়সা—আর দেখো এখানে কিনতে হয় না। কুড়িয়ে নেব—হ্যাঁ কেউ কিছু বলবে না তো ?

—কে আবার কি বলবে ?বাগানে চালতে পড়ে আছে, কুড়িয়ে নেবে তা কে কি বলবে এসব পাড়াগাঁয়ে ?

এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন—ও কে গো ?

চাহিয়া দেখি একটি বাইশ-তেইশ বছরের যুবক একটা ঝুড়ি হাতে ওদিক হইতে বন ঠেলিয়া গাছতলায় সম্ভবত চালতে কুড়াইতে আসিতেছে। আমাদের দুজনকে দেখিয়া সে একটু সমীহ করিয়া থমকিয়া পড়িল। আমি তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলাম—চালতে গাছ কি তোমাদের ?দুটো চালতে কুড়ুচ্ছি কিন্তু—

যুবক হাসিয়া বলিল—ইউ মে টেক, নট মাই ট্রি !

তাই তো, এ দেখিতেছি ইংরেজি জানা লোক, নিতান্ত গ্রাম্য লোক নয় তাহা হইলে। যদিও আমার সঙ্গে ইংরেজি বলার সার্থকতা কি তাহা বুঝিলাম না ?

বলিলাম—আপনার বাড়ি এখানেই বুঝি ?

—নো, আই ওয়াজ এ ক্লার্ক অ্যাট ক্যালকাটা, নাউ আই হ্যাম হিয়ার।

—বেশ বেশ, তাহলে আমাদের মতোই অবস্থা দেখছি। জাপানী বোমার ভয় ?

যুবক হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল, হাঁ-না কিছুই বলিল না।

বৈকালের দিকে ছোকরার সঙ্গে ভালো করিয়া আলাপ হইল। জানিলাম, তাহার নাম সুরেশ। আমার ভগ্নীপতির বাড়ির পাশে যে মুখুজ্যেবাড়ি, সে সেই বাড়ির রাসু মুখুজ্যের শ্যালক। মুখুজ্যেবাড়ির অন্যান্য লোকে কলিকাতায় ও কলিকাতার বাহিরে বিভিন্ন স্থানে চাকরি করে, কখনো বাড়িঘরে না আসার দরুন পৈতৃক সুবৃহৎ দোতলা বাড়ি ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, বর্তমানে সেই বাড়ির রাসু মুখুজ্যেই গবর্নমেন্টের দপ্তরখানায় কেরানীগিরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বাড়ি আসিয়া তিন বৎসর যাবৎ বাস করিতেছেন। গোটা পঞ্চাশেক টাকা পেনশন পান বলিয়া দেশে আছেন, নতুবা কলিকাতায় বাসা করিতেন।

বলিলাম—তুমি কি এই তিন বছরই এখানে আছ ?

—হ্যাঁ দাদা। হোয়ার শ্যাল আই গো ?এখন চাকরি নেই কিনা ! তবে শিগগিরই হবে।

—বেশ বেশ, খুব ভালো। তোমাদের দেশ কোথায় ?

—দেশ ছিল ক্যালকাটার পাশেই—ইয়ে রাজবল্লভপুরে, টালিগঞ্জের ওদিকে। এখন সেখান কেউ নেই। মা এখানেই থাকেন, দিদি আছেন। আমিও এখানেই এখন আছি, তবে আই হোপ, এই মার্চ মাসেই আই উইল সিকিওর এ সার্ভিস। আই অ্যাম এ ম্যাট্রিক পাস্‌ড্‌।

—বাঃ, খুব ভালো।

ছোকরার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে বেশ একটু কৌতুক বোধ করিতে লাগিলাম। বেশ চেহারা, মাথার চেরা সিঁথিটি যত্নে তৈরি করা, পরনে আধময়লা ধুতি, গায়ে গেঞ্জি, বোধ হয় কিছুক্ষণ আগে বিড়ি টানিতেছিল, আমায় দেখিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, কারণ বিড়ির ধোঁয়ার গন্ধ বাতাসে।

—আপনি বুঝি সার, ক্যালকাটাতেই—

—হ্যাঁ, আমার কর্মস্থান কলকাতাতেই ছিল, স্কুলে মাস্টারি করতাম। এখন স্কুল সব বন্ধ, তাই এখানে—

—আপনি কি পাশ সার ?

—এম. এ. পাশ করেছিলাম।

ছোকরা বিনয়ে সম্ভ্রমে কাঁচুমাচু হইয়া বলিল—দেন্ ইউ আর এ কাল্‌চার্ড ম্যান সার— ভারি খুশি হলাম আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে। আই অ্যাম ওন্‌লি ম্যাট্রিক পাস্‌ড্‌—কিন্তু দেখুন সার, লেখাপড়া আমি বড় ভালোবাসি।

—সে তো খুব আনন্দের কথা। ভদ্রলোকের ছেলে, হবারই তো কথা।

—প্রেন্টিস সাহেব দাদাবাবুদের বড়সাহেব। একদিন দাদাবাবুদের আপিসে গিয়ে চুপ করে বসে আছি, প্রেন্টিস সাহেব যাচ্ছে বারান্দা দিয়ে। জানেন তো স্যার, প্রেন্টিস সাহেব চিফ সেক্রেটারি টু দি গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল—কি চেহারা। গটগট করে যাচ্ছে কি—সাহেব বাচ্চা ! দাদাবাবুর ঘরের সামনে দিয়ে গেল একেবারে। দেখেছেন প্রেন্টিস সাহেবকে দাদা ?

—না।

—মস্তলোক প্রেন্টিস সাহেব। দেখুন, কত বড় বড় লোকের সঙ্গে মিশে এসেছি, এখন এই পাড়াগাঁয়ে যত সব আনকালচার্ড লোকের সঙ্গে মেশা—আই ডু নট লাইক ইট।

যদিও বুঝলাম না সে প্রেন্টিস সাহেবের সঙ্গে মেলামেশা কি ভাবে এবং কখন করিল, তবুও ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া বলিলাম, ঠিক কথা, ঠিক কথা !

বাড়িতে আসিয়া স্ত্রীর কাছে সব বলিলাম। স্ত্রী বলিলেন—আহা ছোকরাটি ভালো, এখানে ভগ্নীপতির বাড়ি পড়ে আছে কেন ?অল্প বয়েস—চাকরি করে না কেন ?

—বেকারের সংখ্যা তো জানোনা দেশের। কত বি. এ., এম. এ. ফ্যা-ফ্যা করছে এ বাজারে—ও তো সামান্য ম্যাট্রিক, ওকে চাকরি দিচ্ছে কে ?

দিনকতক কাটিয়া গেল। একটি জিনিস খুব কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিলাম, পাড়াগাঁয়ে লোকে সময় কি করিয়া কাটায়। এসব নির্জন পল্লীগ্রামে সময় কাটানো যে কত কষ্টকর তা যাঁহার অভিজ্ঞতা নাই তিনি বুঝিবেন না। কলিকাতা হইতে আসিয়া নিতান্তই কষ্টে পড়িয়াছিলাম, অথচ দেখিলাম পেনশন-প্রাপ্ত বাসু মুখুজ্যে সকালে উঠিয়া একখানা ন-হাতি কাপড় পরিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ জঙ্গল পরিষ্কার করিতেছেন, মানকচুর চারা এখান হইতে ওখানে পুঁতিতেছেন, মাঝে মাঝে তামাক খাইতেছেন।

আমাকে দেখিয়া বলিলেন—নিতুবাবু যে ?কোথায় চললে ?

—যাব আর কোথায় ! আপনাদের গ্রামে মোটে তিনঘর ভদ্রলোক, কার বাড়ি গিয়েই বা বসি ?

এসো এসো, আমার এখানে একটু বোসো। তামাক খাও ?

—আজ্ঞে না।

তিনি আমার পাশে আসিয়া বসিলেন এবং কি করিয়া বাড়ির পিছনের জমিতে আর-বছর কুমড়া লাগাইয়াছিলেন, এবার মানকচু কি রকম পুঁতিয়াছেন—এই সকল গল্প কিছুক্ষণ করিয়া আমায় বলিলেন—চা খাবে ?ও সুরেশ—

রাসু মুখুজ্যের শ্যালক আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দুজনের জন্য চা আনিতে বলিয়া আমায় বলিলেন—এই গ্রামে ধরো পঁচিশ বছর পরে এসে আজ তিন বছর বাস করছি—তা আছি বেশ। ঝঞ্ঝাট নেই—খাঁটি দুধটুকু বাড়ির গরুর—

পল্লীগ্রামের সুখ-সুবিধার নানারূপ গল্প করিতে করিতে চা আসিয়া গেল।

ছোকরা চা দিয়া বলিল—গুড় আর চিনি নেই, দিদি বলে দিলে।

রাসু মুখুজ্যে কর্কশকণ্ঠে বলিলেন—নেই তা নিয়ে এসো গে বাজার থেকে,...আমায় বলতে এসেছেন চিনি নেই ! যাও, বাজার থেকে এনে রাখো। তোমার দিদির কাছ থেকে পয়সা নাও যে যাও—কুঁড়েমি আমি একেবারে দেখতে পারি নে।

ছোকরা খুব কাঁচুমাচু করিয়া চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই দুইটি তেলের ভাঁড় আর একটা ছোট থলের প্যাকেট লইয়া আমাদের সামনে দিয়াই বোধ হয় বাজারেই চলিল। বেলা প্রায় দশটা বাজে, নেউলের বাজার এখান হইতে যাতায়াতে সাত মাইল পথ—রাসু মুখুজ্যে যে তাঁহার শ্যালকটির উপর যথেষ্ট স্নেহশীল নহেন, তাহা এই ব্যাপার হইতেই বুঝিতে পারিলাম।

সন্ধ্যাবেলা দুধারে জঙ্গলাবৃত সরু পথে একটু পায়চারি করিতেছি, রাসু মুখুজ্যের শ্যালক পিছন হইতে বলিল—সার ?

—এই যে সুরেশ ! খবর কি ?

—ভালো লাগে না সার একটুও এখানে। আসুন কোথাও বসে গল্প করা যাক। আসুন আমার সঙ্গে।

কিছুদূর দিয়া একটা চারিদিক খোলা চালাঘর।

ছোকরা বলিল—এই হল গাঁয়ের বারোয়ারি হল, অর্থাৎ টাউন হল।

—ও।

—দেখুন তো যত সব চাষার কাণ্ড ! এমন গাঁয়ে ভদ্রলোক থাকে ?

—তা তো হল, এখানে বসবে নাকি ?কি পেতে বসবে এখানে ?

—দাঁড়ান, নবীনের বাড়ি থেকে দুটো বিচুলি নিয়ে আসি। তা ছাড়া আর কি পাতি বলুন ?

কিছুক্ষণ পরে ছোকরা বিচালি হাতে ফিরিয়া বলিল, একটু চায়ের বন্দোবস্ত করে এলাম। নবীনের বাড়ি বলে এলাম—এখুনি করে দিয়ে যাবে। ওরা জাতে কাপালী। আপনি যেন দাদাবাবুকে বলবেন না গিয়ে। দাদাবাবু বড় বকে। আচার-বিচের খুব কিনা ?বড্ড গোঁড়া—ভেরি অর্থোডক্স !

বলিলাম—ও।

ছোকরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া হঠাৎ কোনো কথা মনে পড়িবার ধরনে বলিল—আমি আজ পাড়াগাঁয়ে আছি বটে, কিন্তু দাদা বড় বড় লোকের সঙ্গে—আচ্ছা আপনি ল্যাম্বেথ সাহেবকে চিনতেন ?আমি তাঁকে ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাবে দেখেছি সাত হাতের মধ্যে। জে. সি. ল্যাম্বেথ, ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের স্পেশাল অফিসার ছিলেন, ইদানীং ডি আই জি-র পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েছিলেন—সাড়ে সাতশ টাকা মাইনে।

সবিস্ময়ে বলিলাম—বলো কি ! সাত হাতের মধ্যে ?পুলিশ ক্লাবে কি জন্যে গিয়েছিলে ?

অতীত গৌরবের দিনের স্মৃতি মনে পড়াতে মানুষের মুখে যে আনন্দের রেখা ফুটিয়া ওঠে, ছোকরার সারা মুখমণ্ডলে তাহা পরিস্ফুট হইতে দেখিলাম। সে স্বপ্নভরা চোখ আকাশের দিকে তুলিয়া বলিল—কুণ্ডু অ্যান্ড সন্স কেটারার ছিল পুলিশ ক্লাবের অ্যানুয়েল গ্যাদারিং-এ, কুণ্ডুদের বড় ছেলে হরিচরণ আমার বুজম্ ফ্রেন্ড কিনা। তারা একখানা করে কার্ড দিত, এতবড় কার্ড, সোনার জলে নাম লেখা। আমি দুবার গিয়েছি। গ্র্যান্ড হোটেলে গ্যাদারিং হত। আমি প্লেটে কেক দিতে গেলাম, আমায় হিউজেস বললে—নো মোর, থ্যাঙ্ক ইউ।

—হিউজেস সাহেব আবার কে ?

—জোসেফ হিউজেস, ম্যাক-আর্থার কোম্পানির বড়সাহেব—ওই যে ক্লাইভ স্ট্রীটে পাঁচতলা মস্ত বড় বিল্ডিং—সাতশ ক্লার্ক খাটে তার আন্ডারে। এই গোঁফ, চোখ দুটো দেখলে ভয় করে, বাঘের জাত। সে কিন্তু কেমন হেসে বললে—নো মোর, থ্যাঙ্ক ইউ ! আচ্ছা, ওরা এমনি খুব ভদ্রলোক, কি বলেন ?

—নিশ্চয় নিশ্চয়, বাঃ—

ছোকরার কিন্তু আমার উত্তরের দিকে আদৌ মন ছিল না, সে অন্যমনস্কভাবে পূর্ববৎ স্বপ্নময় চোখে গলিয়া চলিয়াছে। একবার রামনগরের মহারাজা কাউন্সিল হাউস হইতে বাহির হইতেছেন, সে কোন্ বারান্দার দুয়ারে দাঁড়াইয়া ছিল, একেবারে তাহার গা ঘেঁষিয়া মহারাজা চলিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ মহারাজের হাতের সোনা-বাঁধানো বেতের গুঁতা তাহার গায়ে সামান্য ভাবে লাগিয়েই খোদ মহারাজা স্বয়ং তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন—ও, আই অ্যাম সো সরি।—আজও তাহার কানে কথাগুলি লাগিয়া আছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—সেখানে কি জন্যে গিয়েছিলে ?

বলিলাম—বাঃ, দাদাবাবু তো সেখানেই টাইপিস্ট ছিলেন, দেখা করতে গিয়েছিলাম যে ওঁর সঙ্গে !

বলিলাম—বাঃ, তুমি তাহলে তো অনেক বড় বড় লোক দেখেছ !

ছোকরা উৎসাহের সুরে বলিল—তা আপনার আশীর্বাদে সার, অনেক দেখেছি, আজই পড়ে আছি এই অজ পাড়াগাঁয়ে। আই হ্যাভ সীন মেনি মেনি বিগ পি্প্ল্—সেই জন্যে আমার ভালো লাগে না এসব জায়গা।

এই সময় একটি বিধবা স্ত্রীলোক একখানা কাঁসার থালায় দু পেয়ালা চা সাজাইয়া আনিয়া আমাকে দেখিয়া একটু সঙ্কোচবোধ করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

ছোকরা বলিল—এসো না, দিয়ে যাও। ইনি পশুপতিবাবুর আত্মীয়। লজ্জা নেই, নিয়ে এসো।

তবুও মেয়েটি না নড়াতে আমি বলিলাম—তুমি গিয়ে নিয়ে এসো।

চা খাইতে খাইতে সুরেশ বলিল—আমার একটু ভালো লোকের সঙ্গে কথা বলবার ঝোঁক আছে চিরকাল। তা এই সব জায়গায় আপনি কোথায় পাবেন বলুন ! সব মুখ, নো ওয়ান ইজ ইভ্‌ন্ ম্যাট্রিক পাস্‌ড্ ! দুটো ভালো কথা বলি এমন মানুষ নেই। মন যেন কেমন হাঁপিয়ে উঠছে।

সময় কাটাও কি করে ?

—বাড়ির কাজ করি। বাজারে যাই, নবীনদের বাড়ি এসে মাঝে মাঝে বসি। তা নবীন বরং ভালো, দুটো ভালো কথা শুনতে চায়। ওকে সেদিন বললাম, তোরা এখানে কেমন করে থাকিস ?আমি দেখেছি কলকাতায় বড় বড় লোকের বাড়ি আলাদা নাইবার ঘর আছে, তাকে বাথরুম বলে। গরম জল, ঠাণ্ডা জল। মেদিনীপুরের জমিদারের রডন স্ট্রীটে যে বড় বাড়ি আছে দেখেছেন ?একবার আমি তাঁদের বাড়ি গিয়েছিলাম আমার এক বন্ধুর সঙ্গে। দোতলায় বাথরুম। বাড়িখানা কি। বাথরুমে একখানা আয়না আছে, সমস্ত শরীর একসঙ্গে দেখা যায়। মেঝেতে আপনি কেন মুখ দেখুন না, এমনিই সুন্দর করে পালিশ করা। সকালবেলা গিয়েছিলুম, বাবুর জন্যে খাবার গেল—চেয়ে চেয়ে দেখলাম, ডিম-সেদ্ধ, টোস্ট আর দুটি রসগোল্লা, দুটো কলা। আমাদের একমুঠো চালভাজা, তাও সবদিন জোটে না সকালে উঠে ! তাই নবীনকে বললাম—তোরা বেঁচে আছিস ভূতের মতো। মানুষে এমন করে বাস করে না। মানুষের মতো বাস করতে হলে কলকাতায় গিয়ে দেখে আয়।—আপনি কি বলেন দাদা ?

কথাটা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি, সুতরাং বলিলাম—সে কথা খুবই ঠিক। এসব জায়গায় বর্ষাকালে থাকা অসম্ভব। যেমন কাদা তেমনি মশা। চাহিয়া দেখিয়া বেশ আমোদবোধ করিলাম, বেশ জায়গাতে বসিয়া চা-পান করিতেছি বটে। গ্রাম্য শ্যাওড়া ভাঁট শিউলি গাছের জঙ্গলে ঘেরা একখানা চালাঘরে মাটির মেঝেতে বিচুলি বিছাইয়া আংটা-ভাঙা পেয়ালায় কাপালীদের বাড়ির তৈরি চা খাইতে খাইতে দুজনে কলিকাতার সুখ-সুবিধার কথা আলোচনা করিতেছি।

ছোকরাও বোধ হয় একই কথা ভাবিতেছিল। কারণ সে এই সময় হঠাৎবলিল—কতদিন কলকাতায় যে যাইনি। ওই সেদিন বললাম না কুণ্ডু অ্যান্ড সন্স, পুলিশক্লাবে যারা খাবার সাপ্লাই করেছিল—প্লাম কেক, স্যান্ডউইচ, বিস্কুট, আরো সব মেলা কি কি—ওদের দোকান হল হগ মার্কেটে, কুণ্ডুদের বড় ছেলের সঙ্গে আমার ভাব—তা ওদের দোকানে সকালে বসে আছি, এমন সময় একজন মোটা মতো ভদ্রলোক, দিব্যি চেহারা—দোকানে এসে কি চাইলে। কুণ্ডুদের ছেলে বললে—ইনি কে জানো ?আমি বললাম, না। বললে, মহারাজা অব নাটাগোড়। আমি তো অবাক ! বলব কি আপনাকে, আমার গা শিউরে উঠল। কত নাম, কত টাকাকড়ি, খবরের কাগজে কত ছবি বার হয়—এই সেই মহারাজা অব নাটাগোড়, দেখি মহারাজার আরদালি জিনিস নিয়ে গিয়ে, ইয়া বড় মটর দাঁড়িয়ে আছে, তাতে তুললে ! সেসব এক দিন গিয়েচে ! এই আমি আর ওই মহারাজা ! এখন এখানে বসে বাগদি-দুলে বাড়ি বেরিয়ে বেড়াচ্ছি ! আজ আপনি এসেছেন, তাই আপনার সঙ্গে দুটো ভালো কথা বলছি, নইলে এতক্ষণ নবীন কাপালীর বাড়ি বসে গল্প করতে হত !

—আহা, তোমার ভগ্নীপতি রাসুবাবু তো অনেক ভালো ভালো লোকের সঙ্গে মিশেছেন—তা এখন কি করে দিন কাটান ?

ভগ্নীপতির উপর দেখিলাম ছোকরার অসীম শ্রদ্ধা। ভগ্নীপতির সঙ্গে কতবার তাঁর আপিসে গিয়া বড় বড় লোক দেখিয়াছে—ইডেন গার্ডেনের পাশে প্রকাণ্ড বাড়ি, এই বড় থাম,—আবার ছোকরা স্মৃতির সমুদ্রে ডুবিয়া গেল।

এই সময় কাপালীদের বাড়ি হইতে সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়া পূর্ববৎ দুরে দাঁড়াইল। ছোকরা বলিল—পান নিয়ে এসেছে। চায়ের এগুলো দিয়ে আসি আর পান আনি।

একটা কাঁসার বাটিতে চার খিলি পান লবঙ্গ দিয়া মুড়িয়া পরিপাটি করিয়া সাজা। ছোকরা বলিল—আমি পান খাই নে—আপনি খান।

তার পর আবার আমরা গল্প শুরু করিলাম। দেখিলাম ছোকরার অদ্ভুত ধরনের ক্ষমতা তার নিজেকে প্রতারণা করিবার। তার বর্তমান অবস্থাকে সে কেমন চমৎকার ভুলাইয়াছে ভবিষ্যৎ ওঅতীতের সুখস্বপ্ন দ্বারা !

চাকরি আমার হয়ে যাবে এই জানুয়ারি মাসে। আমার অনেক বড় বড় সহায় আছে। কলকাতায়। এখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। একটা ভালো লোকের মুখ দেখতে পাইনি আজ তিন বছরের মধ্যে !

একথা তাহাকে অবশ্য জিজ্ঞাসা করি নাই, এতই যদি তাহার সহায়, তবে আজ তিন বছর এখানে পড়িয়া থাকিয়া ভগ্নীপতির বাজার-সরকারি করিতেছে কেন ?

আরো কিছুদিন কাটিয়া গেল। একদিন চৈত্র মাসের দুপুর রোদে দেখি সে সাত মাইল দূরবর্তী বাজার হইতে প্রকাণ্ড একটি ভারী মোট ঝুলাইয়া আসিতেছে। খালের ধারে আমার সঙ্গে দেখা।

আমাকে দেখিয়া মোট নামাইয়া গাছের ছায়ায় একটু বসিল। বলিলাম—এতে কি ?

—হাট-বাজার করে ফিরছি। আটা, ডাল, নুন, এই সব।

—রাসু মুখুজ্যে আজ সকালে বকাবকি করছিলেন কাকে ?

—দাদাবাবুর মেজাজ বড় গরম। বাগ্‌দিপাড়ার এক প্রজাকে ডাকতে পাঠালেন, একটু দেরি হয়েছে ফিরতে আমার, আর অমনি বকাবকি শুরু করেছেন।

—তোমার দিদি কিছু বলেন না ?

—দাদাবাবুকে দিদি বড় ভয় করে চলে।

ছোকরা চলিয়া গেল। সে রাত্রেই আমার স্ত্রী বলিলেন—আচ্ছা, রাসু মুখুজ্যের শাশুড়ি এখানে থাকেন কেন ?

—তা কেমন করে বলব ?

—বড় ভালো লোক। এমন হাতের রান্না ! আমায় বিকেলে আজ জলখাবার খাইয়েছিলেন। যেমন মিষ্টি কথাবার্তা—বাবা, রাসুবাবু ওঁর শালাকে যা বকলেন আমার সামনে। বাজার থেকে কি জিনিস ভুলে আনেনি। একেবারে নন্‌সেন্স, বেরিয়ে যাও, বসে বসে গিলছ ! এমন সব যা-তা বললেন, মায়ের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

—মুখুজ্যে মশায়ের স্ত্রী কিছু বললেন না ?

—ও বাবা, তিনি ভয়ে কাঁটা ! মানে একটু কিন্তু-কিন্তু মনেই হয় তো ?এই বাজারে মনে ভাব, মা ভাই সংসারের গলগ্রহ তো ?আচ্ছা, কেন ছেলেটিকে বলো না কোথাও গিয়ে কিছু করতে ?এর চেয়ে যে বেরিয়ে গিয়ে যা হয় একটা কিছু করাও ভালো। যতদূর বুঝলাম মায়ের মনে খুব দুঃখু। জামাইয়ের ভাত গলা দিয়ে নামে না।

শুনিয়া খুবই দুঃখিত হইলাম। ভাবিলাম, কালই ছোকরাকে বুঝাইয়া বলি। অল্প বয়স, এই তো জীবনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া যুঝিবার সময়; সারা-জীবন তার সামনে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে অগ্রসর হোক বীরের মতো—তবে তো সে নিজেকেও খুঁজিয়া পাইবে। এ বাঁচা তো জড় পদার্থের অচলত্ব, ইহা তাহাকে বুঝাইতেই হইবে।

পরদিন তাহার সঙ্গে আবার দেখা। সে নিজেই আমাকে বলিল—দেখুন, একটা কাজ পাচ্ছি এখানেই বাড়ি বসে—নেব ?কাপালীপাড়ার সবাই বলছে গ্রামের বারোয়ারি ঘরে একটা পাঠশালা খুলতে। ছাত্র-পিছু চার আনা দেবে। বিশ-পঁচিশটে ছাত্র আপাতত হবে। তার পর ওরা আরো জোগাড় করে দেবে বলেছে। কি বলেন ?ভালো হবে ?

–বসে না থেকে ভালোই, যা পাও। তোমার পক্ষে বসে থাকাটা—

দিনকয়েক পরে বারোয়ারি ঘরের দিকে বেড়াইতে গিয়া দেখি ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে শটকে পড়িতেছে—

দুয়ের পিঠে সাত দিলে সাতাশ হয়,
সাতাশের সাত নামে হাতে দুই রয়।

আমাকে দেখিয়া সুরেশ বলিল—আসুন সার, বসুন একটু।—সাতটি ছাত্র আর এই চারটি ছাত্রী জুটেছে—আরো অনেক আসবে বলেছে সামনের মাস থেকে। নবীন, সাধু বাগদি, হরি কলুএরা সব ভরসা দিয়েছে।

আমি কিন্তু খুব ভরসা পাইলাম না। ছোকরা যে রকম খুশির সুরে পাঠশালাটিকে কেন্দ্র করিয়া স্বীয় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অঙ্কিত করিতে লাগিল, তাহাতে তাহার উপর বড় মায়া হইল। এই অতি সামান্য মোচার খোলায় সে সমুদ্রপারের যে কল্পনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যে কত ক্ষণভঙ্গুর সে সম্বন্ধে এই অনভিজ্ঞ যুবক কিছুই জানে না। পাড়াগাঁয়ের পাঠশালা। এইসব ধেড়ে ছাত্রেরা গরু চরাইত, লেখাপড়ায় ইহাদের মন নাই। দুর্গন্ধ মলিন বস্ত্র পরিয়া ভাঙা শেলেট ও কোণ-কোঁকড়ানো প্রথম ভাগ হাতে এই বয়সে বিদ্যালয়ে পড়িতে আসিয়াছে, তাহার কারণ—এখন মাঠে মাঠে ধান, গরু চরাইবার সুবিধা নাই—ভাদ্রের প্রথমে আউশ ধান কাটিবার পর যেমন মাঠ ফাঁকা হইয়া যাইবে, ইহাদেরও ছাত্রজীবন সাঙ্গ হইয়া রাখাল-জীবনের শুরু হইবে। পাড়াগাঁয়ের ধাত জানিতে আমার বাকি নাই।

সুরেশ আমার কাছে বসিয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিল—বি. এ. পাশ করে চাকরি করার চেয়ে এ ঢের ভালো। আপনি দেখুন হিসেব করে, এরা দেবে চার আনা করে মাথা পিছু—পঞ্চাশটি ছাত্র হলেই পঞ্চাশ সিকে অর্থাৎ সাড়ে বারো টাকা। তাছাড়া এরা ধানের সময় ধান দেবে, ক্ষেতে ডাল হলে ডাল দেবে, কলাটা মুলোটা—।বাড়ির খেয়ে এ যে-কোনো চাকরির চেয়ে ভালো। আমি কেবল ভাবছি এ আমি এতদিন করিনি কেন ?

—রাসু মুখুজ্যে মশায় কি বলেন ?

—তিনিও বললেন বাড়ি বসে না থেকে ও খুব ভালো। আচ্ছা, ইন্সপেক্টরের আপিসে লিখলে কিছু গ্র্যান্ট পাওয়া যাবে না ?মর্গ্যান সাহেবকে আমি ধরতে পারি গিয়ে। মর্গ্যান সাহেবের সঙ্গে ডি. পি. আই.-এর খুব আলাপ। দাদাবাবুর মামাতো ভাই মর্গ্যান সাহেবের আপিসে কাজ করে—তাকে দিয়ে ধরাতে পারি মর্গ্যান সাহেবকে।

—কে মর্গ্যান সাহেব ?

—ক্যালকাটা ট্রেডিং কোম্পানির ম্যানেজার। নাম শোনেননি ?মস্ত লোক !

—তুমি তাকে দেখেছ নাকি ?

ছোকরা আমার কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া উৎফুল্ল মুখে বলিল—আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না দাদাবাবুর মামাতো ভাই তো সেই অফিসে কাজ করেন, আমি একবার চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। ঢুকতেই বাঁ দিকের যে বড় ঘর, মাইকার পর্দা বসানো কাটা দরজা ঠেলুন, এমন স্প্রিং লাগানো আছে, তখনই বন্ধ হয়ে যাবে—সেই ঘরে মর্গ্যান সাহেব বসেন। আমি ফাঁক দিয়ে দেখি এমনি মোটা চুরুট খাচ্ছে। আচ্ছা, ওসব চুরুটের দাম কত ?

—অনেক। আচ্ছা তুমি স্কুল করো, আমি আসি বেড়িয়ে।

যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। স্কুল উঠিয়া গেল দু মাসের মধ্যে। যতদিন টিকিবে ভাবিয়াছিলাম, ততদিনও টিকিল না। একদিন দেখি সুরেশ বেলা একটার সময় বাড়ির পাশের কাঁচকলার ঝাড়ে কোপ মারিয়া গাছ কাটিতেছে।

বলিলাম—স্কুলে যাওনি ?

—ইয়ে—স্কুল উঠে গেল।

—সে কি ! কেন ?

ছাত্র হল না। দু মাস দেখলাম, তার পর কেউ মাইনে দেয় না। ভূতের বেগার আর কতদিন খাটি বলুন ! চাষার ছেলে, ওরা স্কুল-কলেজের মর্ম কি বুঝবে বলুন দেখি ?নিউটন বলেছেন—আমি সমুদ্রের ধারে নুড়ি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি। সার আইজাক নিউটন—একজন কত বড়দরের সাহেব, ভাবুন তো—এদের সেসব কথা বুঝিয়ে লাভ কি ?মরুক গে, আমার ও ভূতের বেগার না খেটে—

রাসু মুখুজ্যে আমায় একদিন বলিলেন—ছোঁড়াটা একেবারে ওয়ার্থলেস। একটা কাজে পাঠাও, তিন ঘণ্টা দেরি করে আসবে ! ও হয়েছে আমার একটা বোঝা।

—একটা কিছু চাকরিতে ঢুকিয়ে দিন না ওকে। এ রকম ঘরে বসিয়ে রেখে—

বসিয়ে রেখেছি কি সাধে ! ম্যাট্রিক থার্ড ডিভিশনে পাশ—ওকে কোথায় ঢুকুই বলো তো ?বি.এ., এম.এ., বাজারে...আমার ঘাড়েই যত—

—কেন, এখানেও খাটে তো কম নয়। হাটে-বাজারে যাচ্ছে, জিনিসপত্র বয়ে আনছে—

রাসু মুখুজ্যে অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন—ওইটেই সবাই দেখে ! আমি কি তবে অত বড় ছেলেকে বসিয়ে বসিয়ে খেতে দেব ?আমার তো সে অবস্থা নয়। আমি নিজে কত খাটি দেখো তো—সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত—

সুতরাং ছোকরার আবার চাকরের জীবন শুরু হইল। গরুর জাব কাটা, গরু মাঠে দিয়া আসা, হাট বাজার করা, আরো সংসারের যাবতীয় পরিশ্রমের কাজ। অথচ আশ্চর্য এই যে, ছোকরার স্বপ্ন তেমনি মায়াময়, কল্পনা তেমনি রঙিন রহিয়া গেল। বাস্তবকে সে স্বীকার করিতে আদৌ রাজী হইল না।

গ্রীষ্মকাল কাটিয়া আষাঢ় মাসের প্রথম সেই যে ভীষণ বর্ষা পড়িল, শ্রাবণ মাস যায়-যায়, সে বর্ষার বিরাম বিশ্রাম নাই। চারিধার জলে ডুবুডুবু, রাস্তাঘাট কাদায় হাবড়, বনজঙ্গলে উঠান ঢাকিয়া গেল। আমার স্ত্রী বলিলেন—ওগো, কলকাতায় সবাই ফিরছে, চল আমরাও যাই—এখানে আর থাকা যায় না। মরি সেখানে বোমা খেয়ে মরব। ভিজে কাঠে উনুন ধরিয়ে আর ফুঁ পেড়ে চোখ কানা হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে, এ আর সহ্য হয় না।

অতএব চলিয়া আসিলাম কলিকাতায়।

আশ্বিন মাসের প্রথমে এই সেদিন ভগ্নীপতির অসুখ উপলক্ষে একবার সেই গ্রামে গিয়াছিলাম। স্টেশনে নামিয়াই সেদিন ভীষণ বর্ষা। অতি কষ্টে সাত মাইল হাঁটিয়া প্রায় সন্ধ্যার পূর্বে গ্রামের মাঠে পৌঁছিলাম। তখনো সমানে বৃষ্টি পড়িতেছে, চারিধার ধোঁয়া-ধোঁয়া। হঠাৎ চাহিয়া দেখি, সেই দুর্যোগের মধ্যে সুরেশ এক-বোঝা কাঁচা ঘাস মাথায় করিয়া কোথা হইতে আসিতেছে। আশ্চর্য হইয়া বলিলাম—সুরেশ যে ! এত বাদলায়—

সুরেশ আমাকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়াছে, তাহার ধরন দেখিয়া বুঝিলাম। কতকটা কৈফিয়তের সুরে বলিল—এই বাদলায় গরুর খাবার নেই কিছু একেবারে। খালপারের মাঠ থেকে দু বোঝা কাঁচা ঘাস...আমি বলি, যাই নিয়ে আসি, দিদি বারণ করেছিল।

সাহস দিয়া বলিলাম—বেশ তো, ভালোই তো। নিজের কাজ নিজে করবে এর মধ্যে কিছু...খুব ভালো। ছোকরার এতটা অভ্যাস নাই, দেখিলাম তাহার রীতিমতো, কষ্ট হইতেছে। ভগ্নীপতির অন্নদাস, না করিয়া উপায়ই বা কি ! রাসু মুখুজ্যে বসিয়া খাইতে দিবে না।

ছোকরা বলিল—কলকাতার অবস্থা কেমন ?

—এখন ঢের ভালো। আবার যেমন তেমনিই হয়েছে।

—যুদ্ধের খবর কি ?একখানা খবরের কাগজ আসে না যে পড়ি !

—ওই এক রকম চলছে।

—তাহলে এবার কলকাতায় গিয়ে একটা কাজে লেগে যাই, কি বলেন ?বোমার হাঙ্গামাযখন অনেকটা মিটেছে, চাকরি একটা জুটিয়ে নেবই। আর্মি অ্যান্ড নেভি স্টোর্সের গ্রিফিথ সাহেব আমায় বললে—ইউ আর দি সন অব এ নোবল ফ্যামিলি, গাঙ্গুলি। আই উইল সী ইউ।—সেবার আমায় নিয়ে গিয়েছিল সেখানে—ওই যে কুণ্ডু অ্যান্ড সন্স, তাদের মেজ ছেলে কন্ট্রাক্টর কিনা ওখানকার, তাই। একেবারে স্পষ্ট বললে, আই উইল সী ইউ—

তাহাকে মনে করিয়া দিলাম না যে, সে বোমার ভয়ে কলিকাতা হইতে পলাইয়া আসে নাই, আসিয়াছে তাহার তিন বৎসর পূর্বে। চাকরি এতদিন করে নাই কেন ?ছোকরা এখনো স্বপ্নরাজ্যেই বাস করিতেছে—কিছুতেই সে রূঢ় বর্তমানকে স্বীকার করিতে চায় না—আমি তার স্বপ্ন ভাঙিয়া দিব কেন ?তবুও কি জানি ছোকরার উপর কেমন সহানুভূতি ও করুণা হইল।

বেচারি !